ভয়, লোভ ও দাস্যবৃত্তির কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক: স্রোতের বিপরীতে প্রত্যাশা

সাঈদ ফেরদৌস

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি সন্ত্রাস, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকদের মঞ্চ 'স্বাধীনচিন্তা শিক্ষক নেটওয়ার্ক' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষকতা ও চিন্তা-অধিকার' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে দুটো ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাঈদ ফেরদৌস এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বখতিয়ার আহমদ। এখানে উপস্থাপিত প্রথম ধারণাপত্রটি পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হল।

আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজকে একসাথে বসেছি; কেননা আমরা মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমনভাবে চলার কথা, তেমনভাবে চলছে না। ভেতর ও বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নামক ব্যবস্থা নানামুখী সংকটে পড়েছে এবং ফলস্বরূপ সমাজ এবং সমাজের মানুষের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের যে দায় রয়েছে, সেই দায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেটাতে পারছে না। খুবই সংক্ষেপে বললে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে: ১। মৌলিক বিশেষায়িত জ্ঞান তৈরি করা এবং গবেষণা করা; বিচ্ছিন্ন দু-একটা সাফল্য বাদে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার কোন রীতিবদ্ধ প্রক্রিয়া দাঁড় করাতে পারেনি। এবং ২। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা, স্বাধীন চিন্তাশীল নাগরিক তৈরি করা। এ বিষয়ে আমাদের সমাজে নানা রেটরিক প্রচলিত আছে; কিন্তু বাস্তবতা হল, এমনকি ৫০বছর আগেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীন মনন তৈরির যে নজির রেখেছিল, এখন আমরা তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাই না।

তবে আমার আজকের প্রস্তাবনার ভরকেন্দ্রে আমি সার্বিক সমস্যাগুলোকে ইচ্ছে করেই রাখিনি। আমি বরং সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের যে চলমান দশা, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের তৎপরতা ও করণীয় নিয়ে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতেই আপাতত আগ্রহী। আপাতত বললাম, কেননা আপনারা সবাই জানেন, সমস্যাগুলো একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। আজকে আমরা যে আলাপে বসেছি, সেটা আমাদের অনেকেরই দীর্ঘদীন ধরে লালন করা ভাবনা এবং রাজনীতির অংশ। অনেক দিন ধরেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর-বাইরের বিবিধ সমস্যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি, তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি; একদিকে ক্ষমতার লেজ ধরে বিশেষ ছাত্রদের মাস্তানি, সন্ত্রাস, একগোষ্ঠী শিক্ষকদের ক্ষমতার কাছে নতজানু হয়ে থাকা, তাদের নীতি-আদর্শহীন দলবাজি, ক্লাসে না পড়িয়ে অন্যত্র ব্যস্ত থাকা, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশকে ক্ষুদ্র দল ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার; অন্যদিকে সংস্কারের নামে পাবলিক প্রতিষ্ঠানের প্রাইভেটাইজেশন, এমনকি ক্রমশ ঘাড়ের ওপর শ্বাস ফেলতে থাকা উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের নিওলিবারেল পলিসি–এসব নিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ অনেক দিনের। এবং এগুলো নিয়ে বারংবার কথা হওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু আজকে আমি এই বিস্তৃত পটভূমিকে আলোচনায় আনব না। একটা বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে কাজ করছে কিংবা করছে না, কী তাদের করার কথা ছিল, কী তারা করতে পারে– এ নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। বাইরের মানুষজন বাদ দিলেও ভেতর-বাইরের এই বিবিধ সমস্যার সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ–শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্রনেতা ইত্যাদি। আমরা যেহেতু শিক্ষকরা আজকে বসেছি, আমি মনোযোগ রাখতে চাইব বিশ্ববিদ্যালয়ের সচলতা/স্থবিরতায় শিক্ষকদের ভূমিকা বিষয়ে।

সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মতই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে; যদিও এই ধারা একেবারে নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই প্রায় সকল ক্ষমতাসীন সরকার এবং সরকারি দল তাদের দলীয় স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব ব্যবহার করেছে। আমল-নির্বিশেষে ক্ষমতার লেজুড় হয়ে থাকা বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের দৌরাত্ম্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ তো বটেই, দৈনন্দিন চলাফেরার পরিবেশও দফায় দফায় বিপন্ন হয়েছে। হল দখলের জন্য প্রাণহানি, গোলাগুলি, হতাহতের ঘটনা আমাদের খুবই চেনা, ছাত্রী লাঞ্ছনা, শিক্ষককে হুমকি- শাসানি–এগুলোও বহুদিন ধরে চলে আসছে। এমনকি আপনি যদি সরকারের অনুগ্রহভাজন না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে পদোন্নতিতে কিংবা ছুটিছাটা পেতে ভোগান্তির শিকার হতে হবে এটাও নতুন নয়। কিন্তু এই চেনা অনিয়মগুলো অতিসাম্প্রতিক সময়ে যেন গুণিতক হারে বেড়ে গেল। পত্রিকায় খবর আসছে যে অমুক উপাচার্য অমুক ছাত্রনেতার জন্য নিজের তোয়ালে মোড়ানো আসনটি ছেড়ে দিয়ে পাশের একটি চেয়ারে বসেছেন। পত্রিকার ক্যামেরায় উপাচার্যকে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের সৈনিকদের বগলদাবা হতে দেখেছি, যারা একটু আগেই ছাত্রী ও ছাত্রদের মারধর, শারীরিকভাবে হেনস্তা করে 'স্যার'কে উদ্ধার করেছে। এ ধরনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে যে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠার কথা, আমরা সবাই জানি, তেমনটা ওঠেনি। অতীতে নানা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ভূমিকা নিয়েছেন। অথচ 'কোটা সংস্কার' ও 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলনে স্কুল, কলেজ, প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেধড়ক হামলা-মামলার শিকার হলেও, তরিকুলের হাড়গোড় হাতুড়িপেটা করে ভেঙে দেয়া হলেও,

একদিকে ক্ষমতার লেজ ধরে বিশেষ ছাত্রদের মাস্তানি, সন্ত্রাস, একগোষ্ঠী শিক্ষকদের ক্ষমতার কাছে নতজানু হয়ে থাকা, তাদের নীতি-আদর্শহীন দলবাজি, ক্লাসে না পড়িয়ে অন্যত্র ব্যস্ত থাকা, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশকে ক্ষুদ্র দল ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার; অন্যদিকে সংস্কারের নামে পাবলিক প্রতিষ্ঠানের প্রাইভেটাইজেশন, এমনকি ক্রমশ ঘাড়ের ওপর শ্বাস ফেলতে থাকা উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের নিওলিবারেল পলিসি

শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হলেও, কিংবা এই আন্দোলনের জের ধরে গৃহবধূ, স্কুল শিক্ষক, অভিনেত্রী কিংবা খ্যাতনামা ফটোগ্রাফারকে গ্রেফতার করা হলেও তেমন জোরদার আওয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিক থেকে ওঠেনি।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শিক্ষকদের একটা বড় অংশ হয় দলানুগত্যের জায়গা থেকে এইসব অনাচারকে মেনে নিয়েছেন বা প্রকারান্তরে সমর্থন করছেন, নতুবা এসবের বিরুদ্ধে সামান্য নিন্দা করার শক্তি বা সাহসও তাঁরা হারিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের অভিযোগ, তৎপ্রেক্ষিতে মামলা এবং পরবর্তীতে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নেয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলানুগত্যে সমর্পিত হওয়ার ভয়াবহতম নিদর্শন। এ ঘটনায় আমরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলোকে কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে দেখিনি। সার্বিকভাবে সমাজে গুম-খুন-রিমান্ড-গ্রেফতারের ফলে যে ভয়ের শাসন তৈরি হয়েছে, তার ছায়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসপটে পড়েছে বলেই মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজে স্বাধীন মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছেন, উদ্ধত তারুণ্যের পাশে দাঁড়াতে প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ায় মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তকণ্ঠের নাগরিক কোথা থেকে তৈরি হবে?

ভয় বাদে অপর যে বিষয়টি শিক্ষক হিসেবে আমাকে পীড়িত করে, সেটি হল লোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর লাভালাভ নিয়ে যে পরিমাণ চিন্তিত, তার কণামাত্র ভাগ ভাবিত নন শিক্ষা, গবেষণা, কিংবা বৃহত্তর সমাজ নিয়ে। উদাহরণ দিই : আজকাল কথায় কথায় অনেককেই বলতে শুনি যে 'সরকারের সচিবরা এই পায়, সামরিক আমলারা ওই পায়, আমরা কেন এই-ওই পাই না?' এমনকি সাম্প্রতিক অনেকগুলো শিক্ষক সমিতির সভার কথা আমি মনে করতে পারি, যেখানে বেতন-ভাতা, পদোন্নতি, ঋণ সুবিধা–এই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনকেও আমরা এ ধরনের বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখি। পেটের দায়ে কে না চাকরি করেন? আমি ছাপোষা মাস্টার, অনেক ক্ষেত্রে এই দাবির বিরোধিতা আমিও করি না। কিন্তু আমার খটকা লাগে যখন শিক্ষকরা এই প্রশ্নটা তোলেন না যে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ নেই? সমাজে, রাষ্ট্রে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও নিত্যদিন যে অনাচার ঘটছে, তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে কেবল নিজেদের বৈষয়িক গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্রিক দাবিদাওয়ার আওয়াজ তোলাটা কি কোনভাবে সমর্থনযোগ্য? ক্ষুদ্র একটা বাসা বরাদ্দ পাওয়া, ক্ষুদ্র একটা হাউস টিউটরশিপ পাওয়া থেকে অমুক জায়গার ভিসি, তমুক জায়গার ট্রেজারার হওয়ার ইঁদুরদৌড়ে যাঁরা ঘর্মক্লান্ত, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শন, সমাজের প্রতি তাঁর ব্যক্তিক, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দায় নিয়ে ভাববেন কখন? মূলত আদর্শ নয়, লোভ শিক্ষকদের একটা অংশকে দলদাসে পরিণত করছে, এবং বলাই বাহুল্য, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যোগ্য-অযোগ্য-নির্বিশেষে ঝাঁকের কই হয়ে উঠতে চাইলেও অযোগ্যরাই এই ঝাঁকে অগ্রগণ্য এবং দড়। দিন যত যাচ্ছে ততই উপাচার্যদেরকে আমরা জ্ঞানের দিক থেকে, ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে নিষ্প্রভ, হাত কচলানো হয়ে উঠতে দেখছি। উত্তরোত্তর তাঁদের ভাষা ও ভঙ্গি দলীয় মাস্তানের মত হয়ে উঠছে। তাঁরা বিচারপতিকে 'চড়' মারতে চান, নিরস্ত্র প্রতিবাদী ছাত্রদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেন, 'ঘাড়ত্যাড়া' সহকর্মীর রিমান্ড নিশ্চিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার শিক্ষকরা সমাজের বাইরের কোন সত্তা নয়। ভয় ও লোভের সংস্কৃতি সমাজে জারি থাকলে তার আঁচ আমার গায়ে লাগবে না এমনটা সব সময় আশা করা যায় না। বরং ক্ষমতার নেক্সাসে বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সে কারণেই দাস্যবৃত্তি সেখানে জেঁকে বসার কথা। আমরা যারা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি, তারা জানি, আমাদের লড়াইয়ের ময়দান অনেকগুলো। এবং এই লড়াই অনেক দিনের। আপাত অর্থে মনে হতে পারে, অসম্ভবের জন্যই লড়ছি আমরা। এ কথা সত্য যে আমাদের পূর্বসূরিরা সমালোচনা, মুক্তচিন্তা কিংবা পাণ্ডিত্যের যে নজির রেখেছিলেন, আমরা তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। সে কারণেই আজকের তরুণ শিক্ষক, যিনি এই নিপীড়ক সময় ও ব্যবস্থায় বেড়ে উঠছেন, তাঁর জন্য আশাবাদী হওয়া কঠিন। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে আমরা লড়ছি এবং প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টিকেও আছি। সংখ্যায় আমরা কম, কিন্তু পেশা, শাস্ত্র, শিক্ষার্থী আর সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বোধ, যা আমাদের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়, সেটাই আমাদের শক্তি। নিপীড়ক শাসক এবং দলদাসরা আমাদের ভয় ও লোভ দেখাবে, বাগে আনতে না পারলে নিগ্রহ করবে সুযোগ পেলেই; কিন্তু যতবার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হবে, আমাদের কর্তব্য হবে আওয়াজ আরো জোরে তোলা, একজন আওয়াজ তুললে তার পাশে আরও দশজন গিয়ে দাঁড়ানো। কর্তব্য হবে সাধ্যানুযায়ী সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ভীতি ও লোভের হাতছানি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর করে তুলছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, সেখানকার নিত্যদিনের আপাত ছোটখাট অনিয়ম নিয়ে নিরন্তর প্রশ্ন তোলাটাই প্রথম কাজ। যেমনটা অরওয়েল বলেছিলেন, 'মিথ্যাচারের কালে সত্য বলাটাই বিপ্লবীর কাজ।'

সাঈদ ফেরদৌস: শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: sferdous70@gmail.com

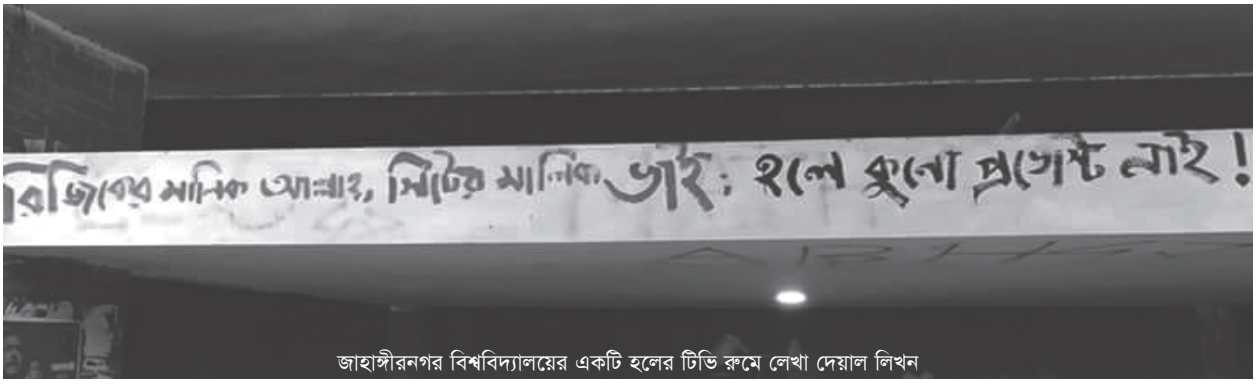

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের টিভি রুমে লেখা দেয়াল লিখন